ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1107-1122
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস (নির্বাচিত): প্রসঙ্গ উনিশ শতকের কৃষক জীবনচর্যা ও নীল বিদ্রোহ

গোপাল ঘোষ, *গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.05.2025; Accepted:25 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The most deprived and neglected class in predominantly agricultural India is the peasant community. This is true in the context of colonial India or 21st century India as well. However, the research on the life of these farmers began during the colonial period. Especially in the context of the 19th century, the opinion of Bengali scholars about farmers is quite significant. Peary Chand Mitra, Akshay Kumar Dutta, Bankim Chandra Chattopadhyay, Dinabandhu Mitra, Harish Chandra Mukherjee were all sympathetic to the farmers. Especially Dinabandhu Mitra's Nildarpan (1860) has presented a realistic account of the life of the indigo farmers of Bengal. Again, the rebellion that the indigo farmers waged against this helplessness is known as the Indigo revolt. Incidentally, the life of the 19th century farmers and the Indigo revolt has become particularly relevant in the post-independence Bengali novel genre. The lives of farmers and the events of the Indigo Rebellion have become the controlling force in the story-building of Bibhutibhushan Banerjee's *Ichamati* (1950), Dinesh Chandra Chatterjee's Neel Ghurni (1378 Bangabdo) and Sunil Gangopadhyay's Sei Samoy (Part 1-1981, Part 2-1982). I would like to shed light on these novels written over a period of time, keeping in mind the lives of farmers and the events of the Indigo Rebellion.

Kewords: Farmers, Indigo revolt, Post-independence Bengali novel, *Ichamati*, Neel Ghurni, Sei Samoy.

একুশ শতকের ভারতবর্ষ কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আজও উত্তাল। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, থেকে শুরু করে পাঞ্জাব দিল্লির সড়ক পথে কৃষকদের রক্তাক্ত পায়ের ছাপ ভীষণ টাটকা স্মৃতি। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সেই সংবাদ বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগেনি। টুইটার, ইনস্ট্রাগ্রামে বিদেশি রিহানা, গ্রেটা থুনবার্গদের এই নিয়ে প্রতিবাদ সামাজিক মাধ্যমে রীতিমত চর্চিত বিষয়। তবে কেবলমাত্র বিদেশি ব্যক্তি কিংবা কোনো সামাজিক মাধ্যমে কৃষকদের এই দুরবস্থার কথা ফুটে উঠেছে এমনটা নয়, এদেশের সরকারি সংস্থাগুলির বাৎসরিক কিংবা দশক ভিত্তিক পরিসংখ্যানেও কৃষক শ্রেণির ক্ষয়িষ্ণু চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর প্রতিবেদনে প্রকাশিত একুশ শতকের প্রতিটি বছরেই কৃষকদের আত্মহত্যার হার ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। অথচ এই ভারতবর্ষে ৭০ শতাংশ মানুষই কৃষক। যদিও ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতবর্ষে কৃষকদের প্রতি নিপীড়ন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে৷ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শোষিত ভারতবর্ষের অধিকাংশ সাধারণ মানুষই ছিল কৃষক শ্রেণির। তাঁদের অবস্থা কীরূপ ছিল— এই নিয়ে কম বেশি সকলেরই জানতে ইচ্ছা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষকদের জীবনচর্যা নিয়ে শিক্ষিত সমাজকে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষত কৃষকদের জীবনচর্যা নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি বিদ্বৎসমাজের মতামত আসলে উনিশ শতকের সমাজ-বাস্তবতার নিদারুণ বয়ান স্বরূপ। এই সমাজ-বাস্তবতার পরিসর ছিল বহুমুখী। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে

উনিশ শতকে কৃষকদের জীবনচর্যার সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীতে কৃষকদের জীবনচর্যা ও তাঁদের সঙ্কট সম্ভাবনার কথা জায়গা করে নিয়েছে বাংলা কথাসাহিত্য শাখায়। বিশেষত স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালে উনিশ শতকীয় কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে লেখা হয়েছে একাধিক উপন্যাস। সেই আলোচনার প্রবেশের পূর্বে উনিশ শতকের কৃষকদের জীবনচর্যার গতিমুখ নিয়ে উনিশ শতকের মনীষাদের অভিমতকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

(২)

উনিশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে বাংলায় একাধিক সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল। সেই সভা-সমিতিকে কেন্দ্র করে বাংলায় বহু মানুষই কৃষক এবং জমিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ মতামত প্রদান করেছিলেন৷ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ১৫ ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতা সভায় বাংলার কৃষকদের জীবনধারণের মান উন্নয়নে নীলকর সাহেব ও ব্রিটিশ প্রশাসনের কার্যকলাপের উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করেছিলেন[১] এবং নীল চাষ প্রসারের দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে সুপারিশ পাঠান।[২] উনিশ শতকের বিখ্যাত ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ সচেতন ছিলেন৷ বলা বাহুল্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) সভাপতিত্বে 'জমিদার সভা'[৩] বা 'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর৷ সভার নাম থেকেই অনুমান করতে পারা যায়, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশের জন্য এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ আবার ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রি উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) কর্তৃক 'এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪] এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে *ক্যালকাটা রিভিউ* পত্রিকায় লেখেন 'জমিদার অ্যান্ড দি রায়ত' নামক প্রবন্ধ। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে কৃষকজীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ৷ কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে ভারতবর্ষের কৃষকরাই যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ, সে তথ্য লেখক সবিস্তারে তুলে ধরেছেন—

> "ইউরোপ বা এশিয়ার এমন কোনো দেশের কথা আমাদের জানা নেই যেখানে মোট উৎপাদনের অর্ধেক কর আরোপ করা হয়৷ হিন্দু শাসনামলে রাজস্ব ছিল উৎপাদনের এক-দ্বাদশাংশ, এক-অষ্টামাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ এবং বিশেষ ও আপৎকালীন অবস্থায় এক-চতুর্থাংশ৷ ... কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে, বহুক্ষেত্রেই, তা উৎপাদনের অর্ধেক হিসেবে ধার্য হয়েছে।"[৫]

লেখক মূলত এই প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পরবর্তী বাংলার সামাজিক পরিবর্তনকে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করেছেন৷ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাবের মূলে ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন৷ সেই কারণে লেখক কৃষকদের দুরবস্থার প্রতিকার ও উত্তরণের পূর্বে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে পারস্পরিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন বিশদে—

> "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌলিক ভ্রান্ত ভিত্তি, ঠিকা দেওয়ার ব্যবস্থার পরিণতিতে কৃষক নিষ্পেষণ, নিরিখ স্থির না হওয়ার কারণে স্বত্বের অনিশ্চয়তা; মহাজনি প্রথার সর্বনাশী ফল; জমিদার ও নায়েবি আবওয়াব চাপানো, জমিদার ও তার প্রতিনিধির অত্যাচার; পুলিশের তোলা আদায়, প্রশাসনের অসাধুতা; সংশ্লিষ্ট আইনের ত্রুটি বিচ্যুতি, বিচার প্রক্রিয়ায় শুল্কের কুপ্রভাব, সপ্তম ও পঞ্চম রেগুলেশনের অপপ্রয়োগ; নীলকরদের অত্যাচার— সবই গ্রামজনতার দুরবস্থাকে আরও অবনতির দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পিত আয়োজন।"[৬]

পরাধীন দেশের কৃষকদের দুর্দশার মূল শিকড় যে অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার খতিয়ান হয়ে উঠেছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'জমিদার অ্যান্ড দি রায়ত'। উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে কৃষক জীবনের প্রকৃত গতিমুখ ও তাঁদের বাস্তব অবস্থানের যথার্থ দলিল এই প্রবন্ধ।

অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী* (১৮৪৩) পত্রিকা উনিশ শতকে বাংলার সমাজ, রাজনীতি, ধর্মচর্চা সম্পর্কে আলোচনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল৷ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন'। অক্ষয়কুমার দত্তের 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধে বাংলা দেশের সাধারণ কৃষক সমাজের সামগ্রিক জীবনচর্যা ও তাদের সংকট মূর্ত হয়ে উঠেছে৷ তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধের প্রথম দুটি সংখ্যায় মূলত ভূস্বামী কর্তৃক বাংলার কৃষক নিপীড়নের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। প্রাবন্ধিক কৃষকদের জীবিকার সংকটের কারণ অনুসন্ধানে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতাকে দায়ি করেছিলেন৷ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো রূপ নিয়ন্ত্রণের সীমা মানতে চায়নি তৎকালীন জমিদারেরা। কর ব্যবস্থা এতটায় অনিয়ন্ত্রিত ছিল যে মামলা-মকদ্দমায় ভূস্বামী বা জমিদারের কারাজীবনকালে ভিক্ষাবৃত্তিচ্ছলে কৃষকদের থেকে অর্থ আদায় করত। ব্রাহ্মণ সেবা, বিগ্রহ সেবা, দেবত্তোর সম্পত্তি রক্ষা প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কৃষকদের দ্বারপ্রান্তে জমিদারের আদায়বৃত্তি তো লেগেই থাকত। উপরন্তু জমিদারের মামলা নিষ্পত্তি কিংবা কারাবাসকালীন জমিদারি ব্যবস্থা বহাল রাখতে কৃষকদের দায় ছিল সবচেয়ে বেশি। এই শোষণে কোম্পানি ছিল নীরব দর্শক৷ তার ঘুম ভাঙতো কেবল রাজস্ব আদায়কালে৷ আবার অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা-খরা অর্থাৎ আবহাওয়ার খামখেয়ালি অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে শাসকের রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস ছিল কৃষি ব্যবস্থা। কৃষি ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল নীল চাষ। প্রবন্ধের তৃতীয় সংখ্যায় প্রাবন্ধিক নীলকরদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখকের নিপুণ পর্যবেক্ষণ নীলকর সম্বন্ধে— 'নীলকরদিগের কার্য্যের বিবরণ করিতে হইলে কেবল প্রজাপীড়নের বৃত্তান্ত লিখিতে হয়৷'[৭] বস্তুত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধে এই স্বীকারোক্তি আসলে নীলকর ও নীল চাষের ভয়াবহতাকে নির্দেশ করেছে।

উনিশ শতকে বাঙালির কৃষক জীবনচর্যা নিয়ে আলোচনা সমূহের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১৮৭২) প্রবন্ধটি সবচেয়ে চর্চিত৷ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও অসামান্য পর্যবেক্ষণের নিদর্শন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ৷ 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'জমীদার', 'প্রাকৃতিক নিয়ম' ও 'আইন'— প্রাবন্ধিক এই চারটি পরিচ্ছেদে হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্তদের জীবনাবস্থার ভূত-ভবিষ্যতকে বর্ণনা করেছিলেন দেশকালের প্রেক্ষিতে৷ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে দেশের শ্রীবৃদ্ধির বাস্তব সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' অংশে৷ প্রাত্যহিক জীবন ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের দুর্দশায় তিনি ব্যথিত। দেশের শ্রীবৃদ্ধি যে আসলে ওই মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর উন্নতি নয়, একথা প্রাবন্ধিক দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—

> "সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি, কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।"[৮]

ঔপনিবেশিক শাসন নীতির প্রত্যক্ষ অঙ্গ জমিদারি ব্যবস্থা কৃষকদের উন্নতি সাধনের পথে প্রধান অন্তরায় একথা প্রাবন্ধিক স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন 'জমীদার' নামক পরিচ্ছেদে। প্রসঙ্গত জমিদারি ব্যবস্থাকে সমান তালে ইন্ধন যুগিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন৷ এই জমিদারদের ভূমিকা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিমত—

> "জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী৷ ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোটো মানুষকে ভক্ষণ করে।"[৯]

সমগ্র উনিশ শতকে বাঙালির কৃষক জীবনচর্যায় জমিদারদের স্বরূপ উদঘাটনের ভূমিকা পালন করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচ্য প্রবন্ধ। তবে মহাজনী জমিদারি শোষণের থেকে যে মোটা অর্থ রাজস্ব রূপে কোম্পানির হস্তগত হয়েছিল। তার হিসেব নিকেশ দিলেও আমলা বঙ্কিমচন্দ্র কোম্পানির প্রসঙ্গে নীরব। আবার জমিদারদের শুধুমাত্র সমালোচনা করলে যদি তাঁদের রোষানলে পড়তে হয়, তাই জমিদার উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা— 'আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি।'[১০]

কৃষকদের দুরবস্থা বর্ণনায় তৃতীয় কারণ রূপে প্রাবন্ধিক 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে উর্বর ভূমিতে শস্য উৎপাদনের খামতি না থাকলেও অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষেরই নুন আনতে পান্তা ফুরাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধানে তিনটি বিষয়কে মূলত নির্দেশ করেছেন— দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব। তিনটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। লক্ষণীয় বিষয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অধঃপতনের সূচক যে আরও ঊর্দ্ধগতি হবে, সেই ভবিষ্যৎবাণী প্রাবন্ধিক বহু পূর্বেই করেছিলেন৷ যার বাস্তবায়ন বর্তমান ভারতে আজও ঘটে চলেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'আইন'। প্রাবন্ধিক 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' অংশে এই আইনের স্বরূপ নির্দেশ করেছিলেন— 'আইন সে একটা তামাসা মাত্র— বড় মানুষেই খরচ করিয়া, সে তামাসা দেখিয়া থাকে।'[১১] সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক সমাজ আইনের সৌজন্যে তামাসার সাক্ষী থেকেছে কোম্পানির শাসনকালে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ শাসকের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেখানে সাধারণ কৃষকদের কতটা লাভ হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক ও সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এই আইন প্রণেতা অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকদের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন—

> "প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিনকালে কেহ নহেন কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিশ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরেজ-রাজ্যে বঙ্গ দেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র— কস্মিন কালে ফিরিবে না। ইংরেজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।"[১২]

বস্তুত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র কর্মজীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি। যার ফল ভুগতে হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে কৃষকদেরকে। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে একাধিকবার আইন প্রয়োগ ও পরিবর্তন হয়েছিল এই উনিশ শতকে। কিন্তু বাস্তবে যে কৃষিজীবী সম্প্রদায় জমিদার ও শাসকের জাঁতাকলে প্রতি মুহূর্তে শোষিত নিপীড়িত হয়েছে, হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্ত, পরাণ মণ্ডলদের জীবন পরিণতি তারই প্রমাণ৷ বস্তুত 'জমিদার অ্যান্ড দি রায়ত', 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থার বর্ণন' কিংবা 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে কৃষকদের দুরবস্থার চিত্রই বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে এই কৃষকরা চিরকাল এই শোষণ সহ্য করেনি। আমরা দেখেছি উনিশ শতকে এই কৃষকরাই নীল বিদ্রোহে গড়ে তুলেছে। প্রসঙ্গত স্বাধীনতা-উত্তরকালের সময়পটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ঔপন্যাসিকরা তাঁদের রচনাকর্মের মধ্যে দিয়ে নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহের দিনগুলিকে সজীব করে তুলেছেন।

(৩)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) উপন্যাসে সময়ের সচলতা ও তার প্রতিক্রিয়া বারে বারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) থেকে *ইছামতী* (১৯৫০) উপন্যাস যেন তারই দৃষ্টান্ত। জীবদ্দশায় প্রকাশিত লেখকের শেষ উপন্যাস *ইছামতী*৷ নদী তীরবর্তী গ্রামবাংলার জনজীবনের আখ্যান হয়ে উঠেছে *ইছামতী*৷ উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসকের সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থায় অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ কৃষকদের জীবন তরঙ্গ আন্দোলিত হয়েছিল নীলকরদের আবির্ভাবে। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিঘার পর বিঘা জমিতে ধান, পাট কিংবা রবিশস্য ফসলের জায়গা দখল করেছিল নীল নামক রঞ্জক দ্রব্যের গাছ। নীল চাষের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল এই গ্রামবাংলা। তৎকালীন গ্রামীণ জনপদের উত্থান পতনের মূলে নীলকর এবং নীল চাষ ভীষণভাবে দায়ী— এই ইতিহাস সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি অবগত। তবে *ইছামতী* উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ও তার আবশ্যিক শর্তগুলিকে মান্যতা দিয়ে। তাই এই উপন্যাস নির্মাণের অপরিহার্য উপাদান হয়ে দেখা দিয়েছে ইতিহাস চেতনা। ইতিহাস চেতনার নিগূঢ় উপাদানগুলিকে সামনে রেখে *ইছামতী* উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসের অবতলে আলোকপাত করলে দেখতে পাব ঔপনিবেশিক শাসকের শাসন পদ্ধতি, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও তার রূপান্তর, রাজস্বের আইনগত বিবর্তন, জমিদার, নীলকর, দেওয়ান, গোমস্তা, আমিনদের সক্রিয়তা এবং সর্বোপরি রায়ত বা কৃষকদের উত্থান-পতন। সব মিলিয়ে *ইছামতী* হয়ে উঠেছে জমি-জিরেত ও নীল বিদ্রোহের আখ্যান।

ইছামতী উপন্যাসের কাহিনি মধ্যে বারে বারে নীলকুঠি ও তার কারবার পরিচালনা কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। মোল্লাহাটি নীলকুঠি,[১৩] পাটনা জেলার নারাণগড় নীলকুঠির[১৪] উল্লেখ পায় *ইছামতী* আখ্যানে। কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তারে কেন্দ্রস্থল ছিল এই নীলকুঠিগুলি। বস্তুত উনিশ শতকে এই নীলকুঠিগুলি পরিচালনায় নীলকর সাহেব ও দেশীয় নেটিভদের যৌথ উদ্যোগ লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *ইছামতী* উপন্যাসেও দেখি নীলকুঠির বড়োসাহেব শিপ্‌টন্ নীলকুঠি চালনার জন্য ভরসা করেছে মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান রাজারাম রায়ের উপর। পাঁচপোতা গ্রাম নিবাসী দেওয়ান রাজারাম রায় কুশলী ব্যক্তি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে নীল চাষের বিস্তার উদ্দেশ্যে সমস্ত

ক্ষমতাকে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করেছে—

> "কোনো প্রজার জমিতে জোর করে নীলের মার্কা মেরে আসতে হবে। রাজারাম দুর্ধর্ষ দেওয়ান, প্রজা কী করে জব্দ করা যায় তাঁকে শেখাতে হবে না। আজ আঠারো বছর এই কুঠিতে তিনি আছেন, বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়েচেন শুধু এই প্রজা জব্দ রাখবার দক্ষতার গুণে।"[১৫]

এই দক্ষতার গুণে দেওয়ান রাজারামের প্রভাব প্রতিপত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তালুক, বিষয়, ধানীজমি যা আছে, একটা বড় সংসার চলে। জমিদারির আয় বছরে-তা তিনশো-চারশো টাকা। রাজার হাল। স্বভাবতই দেওয়ান রাজারামের সক্রিয়তার হাত ধরে উনিশ শতকের গ্রামবাংলায় নীল চাষের রমরমা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

নীল চাষ, নীলকুঠির দেওয়ানদের সক্রিয়তার অপরপ্রান্তে সাধারণ কৃষকদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। *ইছামতী* উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে কৃষকদের জীবনচর্যার একটি সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে। যে কৃষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় অবলম্বন তার চাষের জমিটুকু সেখানেও রাজারাম দেওয়ান, নীলকর সাহেবদের প্রবল আধিপত্য লক্ষণীয়। নীল চাষে অনিচ্ছুক চাষিদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নীলকুঠির চুনের গুদামে আটকে রাখা হয়। গ্রামীণ জনপদগুলির দণ্ডবিধানে নীলকর ও নীলকুঠির সিদ্ধান্তই শেষ কথা। ইছামতী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে নীলকরদের সৌজন্যে। কোম্পানি শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় নীলকর হয়ে উঠেছে স্থানীয় শাসক ও বিচারক। নীলকুঠির কোর্টের বিচারে হলা পেকের তিন বৎসর জেল হয়েছে।[১৬] এই ক্ষমতাধর নীলকরদের বিরুদ্ধে তবু মাঝে মধ্যেই শোনা যায় অসন্তোষের সুর তথা কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনা। রসুলপুর, রাহাতুনপুরের চাষিরা জমিতে নীল বুনতে অস্বীকার করেছে। নীলের দাগ মারতে গিয়ে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে নীলকুঠির কর্মীদের। যদিও রাহাতনপুরের কৃষকদের নীল চাষের বিরোধিতার ফল হাতেনাতে পেতে হয়েছে—

> "পরদিন সকালে চারিধারে খবর রটে গেল রাত্রে রাহাতুনপুর গ্রাম একেবারে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। বড় বড় চাষিদের গ্রাম, কারও বাড়ি বিশ-ত্রিশটা পর্যন্ত ধানের গোলা ছিল-আর ছিল ছ'চালা আটচালা ঘর, সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। কী ভাবে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না, তবে সন্ধ্যারাত্রে ছোটসাহেব এবং দেওয়ানজি রাহাতুনপুরের বড় মোড়লের বাড়ি গিয়েছিলেন; সেখানে প্রজাদের ডাকিয়ে নীল বুনবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তারা রাজি হয়নি। ওঁরা ফিরে আসেন রাত এগারোটার পর। শেষরাত্রে গ্রামসুদ্ধ আগুন লেগে ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সকলে সন্দেহ করচে।"[১৭]

তবে সাধারণ কৃষকদের নীল চাষের প্রতি অনীহার মূল কারণ হলো তৎকালীন সময়পটে অর্থনৈতিক দিক থেকে নীল চাষ মোটেও লাভজনক ছিল না। অপরদিকে অর্থনৈতিক মুনাফার সমস্তটায় আত্মসাৎ করেছে নীলকর সাহেব তথা বণিক সমাজ। নীল চাষের অনীহার মূল কারণ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে আমরা *ইছামতী* উপন্যাসের বড়োসাহেব এবং হিংনাড়া অঞ্চলের সাধারণ কৃষক ছিহরির মধ্যে কথোপকথনের প্রতি আলোকপাত করতে পারি—

> "বড়সাহেব ছিহরি সর্দারকে বললে-টোমার মতলব কী আছে?
>
> —নীল মোরা আর বোনব না সায়েব। মোদের মেরেই ফেলুন আর যে সাজাই দ্যান।
>
> —ইহার কারণ কী আছে?
>
> —কারণ কী বলব, মোদের ঘরে ভাত নেই, পরনে বস্তর নেই ঐ নীলির জন্যি। মা কালীর দিব্যি নিয়ে মোরা বলিচি, নীল আর বোনবো না।
>
> —কি পাইলে নীল বুনিটে ইচ্ছা আছে?
>
> —নীল আর বোনব না, ধান করব। যত ধানের জমিতি আপনাদের আমিন গিয়ে দাগ মেরে আসবে, মোরা ধান বুনতি পারিনে। আপনারা নিজেদের জমিতি লাঙল গরু কিনে নীলের চাষ করো-কেউ আপত্য করবে না। প্রজার জমি জোর করে বেদখল করে নীল করবা কেন সায়েব?
>
> —টোমারে পাঁচশো টাকা বকশিশ দিব। তুমি নীল বুনিটে বাধা দিয়ো না। প্রজা হাট করিয়া ডাও।
>
> —মাপ করবেন সায়েব। মোর একার কথায় কিছু হবে না। মুই আপনারে বলচি শুনুন, তেরোখানা গাঁয়ের লোক একত্তরে হয়ে জোট পেকিয়েচে। ভবানীপুর, নাটাবেড়ে, হুদো-মানিককোলির

নীলকুঠির রেয়েতেরাও জোট পেকিয়েচে। হাওয়া এসেচে পুবদেশ থেকে আর দক্ষিণ থেকে।”[১৮]

বস্তুত হিংনাড়া অঞ্চলের সাধারণ কৃষক ছিহরিই কৃষকদের অসন্তোষ ও তাদের ঐক্যের কথা নীলকর সাহেবের কানে পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা দেখব এই ঘটনা অনুষঙ্গের সূত্রে *ইছামতী*-র কাহিনির মধ্যে ক্রমশ নীল চাষিদের প্রতিরোধ আরও জোড়ালো থেকে জোড়ালোতর হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ এবারে যেন ক্রমশ গণচেতনামুখী স্বরকে ধরতে চেয়েছে। বস্তুত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য আখ্যানে নীল বিদ্রোহের ঘটনাবহুল ইতিহাস পরম্পরার সজীব উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেছেন কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনার প্রেক্ষিতে। ইতিহাসের অক্ষরেখায় নীল চাষিদের গণমুখী ভাবধারার প্রবল উপস্থিতির পূর্বে নীলকরদের নিপীড়নের সংরূপকে আত্মস্থ করতে হয়েছিল সমগ্র কৃষক সমাজকে। নিপীড়নের সংরূপ বিদ্রোহের যেন আত্মপ্রস্তুতির স্বরূপ ছিল। উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে ঔপন্যাসিক এই প্রস্তুতিকে সযত্নে তুলে ধরেছেন। তবে এর পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনা ও তার প্রতিক্রিয়া আখ্যানের মূল চালিকা শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে।

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনা ও তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন আলোচ্য আখ্যানে। ঔপনিবেশিক বাংলায় নীলচাষের সম্প্রসারণে নেটিভ দেওয়ান, আমিনদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায় দেওয়ান রাজারামের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। নীলকরদের সমর্থনে এই ক্ষমতার প্রয়োগ সে নিজ দেশের সাধারণ কৃষকদের উপরই করেছিল। নীল চাষের জন্য হত্যা করতেও পিছু পা হয়নি রাজারাম। তাই বিদ্রোহের উত্থানপর্বে নীল বিদ্রোহীদের কাছে অত্যাচারের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারী রাজারাম দেওয়ান। এই অত্যাচারের ফল তাঁকে হাতেনাতে পেতে হয়েছে নীল বিদ্রোহের উত্থানপর্বে। ষষ্ঠী তলার মাঠে দাঙ্গায় নিহত রামু বাগ্‌দির বড়ো ছেলে হারু, তার শালা নারাণ বড়ো সর্দার রাজারামকে হত্যা করেছে।[১৯] *ইছামতী* উপন্যাসে রাজারাম হত্যার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অর্থে নীল বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। এরপর কৃষকদের বিদ্রোহমূলক কর্মসূচির গ্রাফ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হয়েছে আখ্যানের কাহিনি পরিসরে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসে কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনার অভিমুখ নির্দেশের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন, সময়ের অসঙ্গতি, শাসক-নেটিভ সম্পর্কের সীমা অতিক্রম করে কৃষকদের জীবনচর্যা ও বিদ্রোহ আখ্যানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কৃষক নিপীড়নের রক্তাক্ত প্রেক্ষাপটেই কৃষকদের প্রতিরোধের ইতিহাসকে ক্রমপর্যায়ে তুলে ধরেছেন লেখক—

১. “নীল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল সারা যশোর ও নদীয়া জেলায়। কাছারিতে সে খবরটা নিয়ে এলো নতুন দেওয়ান হরকালী সুর।”[২০]

২. “তিন দিন পরে বড় সায়েবের মেম নীলকুঠির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুলতলার ঘাটে বজরায় চাপল।”[২১]

৩. “নীলবিদ্রোহ তিন জেলায় সমান দাপটে চলল। ... তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল দু’বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে কিংবা এদেশি কোনো বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর-পাড়ি দিলে। দু’-একটা কুঠির কাজ পূর্ববৎ চলতে লাগল, তবে সে দাপটের সিকিও ভাগ কোথাও ছিল না।”[২২]

৪. “নীলকর সাহেবদের বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে আজকাল। আশপাশে কোনো নীলকুঠিতে আর সাহেব নেই, কুঠি বিক্রি করে চলে গিয়েছে। দু’একটা কুঠিতে সাহেব আছে, কিন্তু তারা নীল চাষ করে সামান্য, জমিদারি আছে— তাই চালায়।”[২৩]

উদ্ধৃতিকৃত বয়ানের প্রেক্ষিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নীল বিদ্রোহের প্রবল আধিপত্যের সামনে নীলকরদের সাম্রাজ্য খড়-কুটোর মতো ভেঙে পড়েছিল। নীলকরদের পরাজয়, নীলকুঠির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, নীলকরদের দেশে ফিরে যাওয়া, শাসকের নীল কমিশন গঠন, বাঙালি বিদ্বৎসমাজের অগ্রণী ভূমিকা সহ একাধিক কর্মসূচির মূল কারণ নীল চাষিদের বিদ্রোহী সত্তার প্রবল উপস্থিতি। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষকদের বিদ্রোহী সত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখিনি ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস নির্মাণে। তবে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার হাত ধরে কৃষক বিদ্রোহের সমূহের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিদ্যায়তনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে। কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনা এবং বিদ্রোহের সাফল্য ব্যর্থতাকে কেবলমাত্র আর পাঁচটা সাধারণ ঘটনাপ্রবাহ বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে সমূলে

প্রত্যাখ্যান করেছে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রবক্তারা। তাঁরা রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বোপরি ক্ষমতার বিন্যাসের প্রেক্ষিতে কৃষক বিদ্রোহকে দেখতে চেয়েছেন। যেখানে নীলকর, জমিদার, মহাজন, সরকার এবং কৃষকদের সম্পর্কের নতুন সমীকরণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *ইছামতী* উপন্যাসে নীল বিদ্রোহের যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন কাহিনি পরম্পরায়, তাকে এই আলোচনায় ক্রমপর্যায়ে নির্দেশ করার মূল কারণ হলো— নীল বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া গ্রাম-জীবনকে কীভাবে আন্দোলিত করেছিল তার সংরূপটি সরজমিনে প্রত্যক্ষ করা। নীল বিদ্রোহের পূর্ব সময় পর্যন্ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে সঞ্চালক শক্তি ছিল নীল চাষ। এই নীল চাষের উপর ভর করে ঔপনিবেশিক শাসক, বণিক সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। অপরদিকে গ্রামজীবনে কৃষকদের জীবনযাপনের মান ছিল ভয়ঙ্কর অনুন্নত। তাই নীল কৃষকদের বিদ্রোহের অভিঘাতে সমূহ পটপরিবর্তনের গুরুত্বকে কেবলমাত্র পেশাগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল না, আসলে তার শিকড় নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক রাজনীতি, অর্থনীতির বিস্তীর্ণ পরিসরে—

> "ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামজীবনে সেই সম্পর্কের মূল কথা জমিদার, মহাজন ও সরকার— এই ত্রিশক্তির সঙ্গে কৃষকের ক্ষমতাগত সম্পর্ক। সেই সম্পর্কই অর্থাৎ রাজনীতিই ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতির প্রধান ধ্রুবগুণ।"[২৪]

(৪)

উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহকালীন অস্থিরতা ও কৃষকদের গণজাগরণের বহুমাত্রিক পরিসর একাধিক উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠলেও প্রতিটি নির্মাণ স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯১৭-১৯৯৫) *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাস। *নীল ঘূর্ণি* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের শারদীয়া *কিশোর ভারতী* পত্রিকায়।[২৫] শুরুতে কিশোরদের জন্য লেখা হলেও এই আখ্যান পরবর্তীতে বহুবিধ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠেছিল এক সিরিয়াস উপন্যাস প্রকরণ। যার মধ্যে নিহিত লেখকের ব্যক্তিগত আদর্শ, ইতিহাস চেতনা, কৃষকদের জীবনচর্যা সর্বোপরি গণজাগরণের নান্দনিক অভিজ্ঞান। এই উপন্যাস নির্মাণের মূল ভিত্তিস্তর উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহ। উপন্যাস নির্মাণ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> "ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই তার শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁরা নিরলস বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন, তাঁরা হলেন বাংলার বীর কৃষক-সন্তান। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ যে দুর্জয় প্রতিরোধের সংগ্রাম তাঁরা চালিয়েছিলেন অব্যহিত ধারায়, 'নীলবিদ্রোহ' তারই এক সার্থক পরিণতি। এই উপন্যাসে অমর সেই বিদ্রোহী কৃষক-আত্মার অনমনীয় দৃঢ়তার প্রতীক হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কাশীনাথ ও বুলন ফকিরকে বা ফকিরদাদুকে।"[২৬]

লেখকের বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলতে পারি— আলোচ্য আখ্যানের মূল স্বর নীল বিদ্রোহের ঘটনাবহুল পর্ব ও তার প্রতিক্রিয়ার ব্যঞ্জনাময় ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বাঙালি কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন নীল বিদ্রোহ নিয়ে একাধিক উপন্যাস রচনা হলেও *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের আবেদন চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে মূলত ক্রান্তিকালীন সময়ে বাঙালি মুসলমান ফকির এবং হিন্দু যুবক কাশীনাথের অন্তহীন জীবনীশক্তির সমাবেশে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে এদেশীয় দুই বিদ্রোহী বাঙালিকে কেন্দ্র করে কালাতীত সময় পরিসরের ইতিহাস *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কথাবস্তু হয়ে দেখা দিয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে দেখি যুবক কাশীনাথ সর্দার জঙ্গলপুরীতে আশ্রয় নিয়েছে নীলকরদের তাণ্ডব থেকে পরিত্রাণ পেতে। তবে কাশীনাথ তাঁর পিতা কালীনাথের উপর আক্রমণকারী নীলকুঠির লাঠিয়ালদের হত্যা করার পরই বাড়ি ছেড়েছে। নিঃসঙ্গ কাশীনাথের কথা শোনার জন্য প্রয়োজন ছিল তাঁর দোসরের। যে যুবক কাশীনাথের সংকট সম্ভাবনাকে দেখবে সংবেদশীল চোখে। অতঃপর গহীন জঙ্গলে যে বৃদ্ধের সঙ্গে কাশীনাথের আলাপ হয়, ঘটনাক্রমে সেও নীলকরদের নিকট চক্ষুশূল। তাই কাশীনাথ ফকিরকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

> "নীলকররা তো তোমার ওপর বিষম খাপ্পা, পেলেই খুন করে ফেলবে। ইংরেজ সরকারও ঢোল-সহরৎ করে জানিয়ে দিয়েছে, তোমায় জ্যান্ত বা মরা যে ধরে দিতে পারবে, তাকে দু-হাজার টাকা বকশিস দেবে।"[২৭]

কাহিনির প্রারম্ভিক লগ্নেই দুই নীলকর বিরোধী ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যেই স্পষ্ট আখ্যানের ভবিষ্যকথন কী হতে

চলেছে! নীলকরদের প্রতি ক্ষিপ্ত যুবক কাশীনাথের মধ্যে অবিমিশ্র আবেগ ও প্রতিশোধ স্পৃহা বিদ্যমান। আখ্যানের মূল স্বর হয়ে উঠেছে নীলকরদের বিরোধিতা। তবে সেই বিরোধিতার অন্তঃবয়ান আসলে আমৃত্যু বিদ্রোহেরেই নামান্তর। তাই কাশীনাথ বলতে পারে— 'নীলকর, নীলকর! যতদিন বাঁচব, আমি থাকব তোদের চিরশত্রু, তোদের পোষা কুত্তাদের খতম করাই আমার কাজ।'[২৮] উপন্যাসের ঘটনাক্রম ও তার ধারা বিবরণীতে নীলকরদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের প্রসঙ্গ জায়গা করে নিয়েছে স্বতঃসিদ্ধ রূপে। তবে এই গ্রামবাংলায় নীলকরদের জাঁকিয়ে বসার মূলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় লাভ-ক্ষতির হিসাব দায়ি। উপন্যাসের কাহিনি মূলত সেই দিকেই এগিয়েছে। কাশীনাথ ও ফকিরের আলাপচারিতাকে সামনে রেখে আখ্যানকার যেন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় এদেশীয় জনজীবনের সুপরিকল্পিত অবক্ষয়কে নির্দেশ করতে চেয়েছে। এই অবক্ষয়ের সাক্ষী বাংলা তথা সমগ্র ভারতভূমি। অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি সাধারণ ব্যক্তি জনমানসে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তাকে কেন্দ্র করেই *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে। তাই বিদ্রোহের পূর্বে অবদমনের নির্ধারিত শর্তগুলি নান্দনিক সম্পৃক্ততায় ভিড় করেছে কাহিনি রূপে। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, আখ্যানের মূল স্বর যেহেতু কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনা ও তার ক্রমপরিণতি, সুতরাং সেই ক্রমপরিণতির পিছনে যে অবদমনের সূচক বিদ্যমান— তাকেই লেখক সুচারু ভঙ্গিতে নির্দেশ করতে আগ্রহী। কৃষক এবং নীলকর-শাসক সম্পৃক্ততার অভিনিবেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অবদমনের ঘটনাক্রমকে সামনে রেখে। আলোচ্য *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানে যুবক কাশীনাথের সামনে ফকির সেই নিদারুণ অবদমনকেই ব্যক্ত করেছে নির্মোহ ভঙ্গিতে—

> "ফকির বলে চলে, — তুই তো আর আদালতে যাসনি, গেলে এক আজব ব্যাপার দেখতে পেতিস। কোনও রায়ত হয়তো নাচার হয়ে নীলকর সাহেবের অত্যেচারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করেছে। মামলার শুনানির সময় দেখা গেল, রায়ত বাদী বা ফরিয়াদী হয়েও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, আর নীলকর বিবাদী বা আসামি হয়েও হাকিমের পাশেই চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। হাকিম তার সঙ্গে হেসে-হেসে গুজগুজ-ফিসফিস করছে। তারপর রায় বেরোলে দেখা গেল, নীলকর নির্দোষ, যত দোষ রায়তের। তার হয়তো ছ'মাসের জেলই হয়ে গেল।"[২৯]

বস্তুত নীলকরদের এই অত্যাচার সাংগঠনিক রূপ নিয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে। ঔপনিবেশিক শাসকের ইন্ধনেই গ্রামবাংলায় নীলকরদের প্রবল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আইন, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা কার্যত প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল নীলকরদের সক্রিয়তার কাছে। এই নিদারুণ বাস্তবতাকে মান্যতা দিয়ে *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ফলে নীলকরদের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা কীভাবে বীভৎস রূপ নিয়েছিল তারই ভাষ্য হয়ে উঠেছে আলোচ্য আখ্যান। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, আখ্যানকার ফকিরকে সামনে রেখে নীল বিদ্রোহের পূর্বে গ্রামবাংলার সম্ভাব্য বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নীল ঘূর্ণি আখ্যানে অভিজ্ঞ ফকির সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে রায়তদের নিদারুণ ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু জীবনচর্যার সংরূপ। *নীল ঘূর্ণি*-র কথনবিশ্বে এই প্রবাহমানতা আসলে লেখকের মনোভঙ্গির দ্যোতক হয়ে উঠেছে। আখ্যানকার ফকিরকে সামনে রেখে 'রায়ত-নীলকর'— এই বৈপরীত্যপূর্ণ সম্পর্কের ইতিবৃত্তকে নির্দেশ করেছেন অসাধারণভঙ্গিতে—

> "যেদিন থেকে ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়ে বসেছে, সেইদিন থেকেই তো চাষি রায়তদের কপালে এইটা ঘটে আসছে। সাধারণত যা ঘটে তা হল, আদালতে রায়ত একজন সাক্ষীও হাজির করতে পারে না। কী করেই বা পারবে? নীলকর তার নিজেদের গুদোমে বা ফাটকে আটক করেছে, আর নয়তো এমন মার মেরেছ যে, তারা আর আদালতমুখো হতে পারেনি। আর অন্য দিকে নীলকরের পক্ষে একের পর এক সাজানো সাক্ষী বলে গেল, নীলকর নির্দোষ, তার মতো দয়াবান লোক আর হয় না, ওই রায়তটাই যত নষ্টের গোড়া, সে নীলের দাদন নেয়নি, কুঠির পেয়াদাকে ঠেঙিয়েছে, আমিনকে তাড়া করেছে, অন্য রায়তদের নীলচাষের বিরুদ্ধে খ্যাপানোর চেষ্টা করেছে, এমনি আরও কত সাংঘাতিক সব অভিযোগ।"[৩০]

নীলকরদের সামনে সাধারণ রায়তদের অসহায় অবস্থার করুণ স্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে উপরিউক্ত বয়ান মধ্যে। আলোচ্য আখ্যান পাঠের সূত্র ধরে এই অসহায়তার খণ্ড চিত্রগুলিকে কাহিনি পরম্পরা অনুসারে সাজালে পাওয়া যাবে

নীলকরদের অত্যাচারের এক অখণ্ড বিশ্ববীক্ষা। মূলত আলোচ্য কাহিনির শুরু থেকেই নীলকরদের অবদমন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে যুবক কাশীনাথের নিঃসঙ্গতা জীবনের সূত্রে। ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ গ্রন্থের প্রতি আলোকাপাত করলেই চোখে পড়বে এই অবদমনের নিবিড় বিবরণ—

> "The cold, hard and sorbid who can plough up grain fields, kidnap recusant rayets, confine them in dark holes, beat and starve them into submission, which things have sometimes been done, can give no moral guarantee of his capability of filling up a blank paper and turning it to his pecuniary profit."[৩১]

এই নিপীড়নের ইতিহাসকে মান্যতা দিয়েই আখ্যানের ভবিষ্যকথন গড়ে উঠেছে। *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানে বর্ণিত নীলকর এবং রায়ত সম্পর্কের অভিনিবেশ আসলে ইতিহাসের ভিত্তিভূমিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছিল। তাই রায়তদের প্রতি নীলকর অত্যাচারের ভীষণ বাস্তব। আবার কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনার আয়ুধ কথাও তেমনই অধিক সত্য হয়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায়। কৈলাসপুর গাঁয়ের সঙ্গতিপূর্ণ রায়ত গোবর্ধন হাজরা নীল চাষে অসম্মতি প্রকাশ করলে ভালুকপোতা নীলকুঠির সাহেব হিল্‌স ও কার্লো তাঁর বাড়ি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সেই কার্যে গিয়ে নীলকরদের প্রবলভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিরোধিতায় আসলে ভাবী প্রত্যাঘাতের শুভ সূচনা ছিল। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়াকে সযত্নে তুলে ধরেছেন আখ্যানকার। এই ঘটনার অভিঘাত সম্পর্কে কার্লো সাহেবের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— 'কার্লো হকচকিয়ে যায়: এ কী ব্যাপার! নীলকরের লোকদের ওপর হামলা! এ যে তার ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষেও কখনও ভাবতে পারেনি।'[৩২] বস্তুত এই ঘটনা পরিসর গ্রামবাংলায় প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আখ্যানের কাহিনি পরম্পরায় লেখক নীলকরদের প্রতি সাধারণ রায়তদের অসন্তোষের কথা তুলে ধরেছেন। কাশীনাথের দলে একে একে যোগ দিয়েছিল কামালুদ্দিন, কেশব, পাঁচু শেখ, ছিদাম, হরিচরণ, কামাল ও বৃন্দাবন। যারা ব্যক্তিজীবনে প্রত্যেকে নীলকরদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাশীনাথদের প্রথম বড়ো সাফল্য ছিল ভালুকপোতা নীলকুঠির নায়েব দানী ঘোষের হত্যা। আখ্যানকার এই হত্যাকে নিদারুণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। হত্যার ভয়াবহতা এবং তা নিয়ে রায়তদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনাময় উপস্থিতি লেখকের বর্ণনায় বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে—

> "বিষম কাণ্ড! রায়তদের মধ্যে তাই চরম উত্তেজনা। যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তাই ঘটেছে।
> নায়েব দানী ঘোষ খুন!
> দারোয়ান চারজন খুন!
> আর—আর রায়তদের কাছে যা মস্ত বড় খবর— জমিজমা-সম্পত্তির যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ, খাতকদের খত, বন্ধকী তমসুক সব পুড়ে ছাই!"[৩৩]

এই হত্যার মূলে স্বয়ং কাশীনাথ দায়ি সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে আখ্যানের মধ্যে ক্ষমতাহীন থেকে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা চোখে পড়ে। তাই একদা পিতৃ-মাতৃ হারা নিঃসঙ্গ কাশীনাথের মতো সাধারণ কৃষক পূর্ব-প্রস্তুতি এবং ঐক্যের জোড়ে দানী ঘোষের মতো প্রবল প্রতাপশালী নায়েবকে হত্যা করতে পারে। একই সঙ্গে প্রতিরোধ, বিদ্রোহের ফলে চলমান ক্ষমতার রদবদল তথা প্যারাডাইম শিফট-এর সমীকরণ নির্দেশে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন লেখক—

> "নিজের হাতে কাশীই খুন করেছে তাকে। তখন সে বলেছিল — এমনি করে মা-বাবার মৃত্যুর শোধ তুলব, রায়তদের ওপর অত্যাচার-খুন-রাহাজানির বদলা নেব। এমনি করেই নিপাত করব নীলকর শয়তানদের আর তাদের পোষা কুত্তার দলকে।"[৩৪]

'বদলা নেব', 'নিপাত করব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে কাশীনাথের এই বক্তব্য যেন এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। কাশীনাথের নেতৃত্বে নীলকর ও তার সহযোগীদের পরাভূত হওয়ার ঘটনায় গ্রামীণ সমাজে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল সাধারণের মনে। যদিও গ্রামবাংলায় নীলকরদের নিরঙ্কুশ দাপট রাতারাতি পরিবর্তিত রূপ নেবে এমনটা ভাবা খানিকটা কষ্টসাধ্য। কারণ তারা আসলে ঔপনিবেশিক শাসক অনুমোদিত ক্ষমতাসীন শ্রেণি। তাই কেবলমাত্র প্রত্যাঘাতের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় নীলকরদের অবস্থান বিলুপ্ত হয়নি বরং গ্রামবাংলায় ক্ষমতাসীন নীলকরদের প্রবল

আধিপত্যের কথা কাহিনি বিন্যাসে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাই *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি পরম্পরায় নীলকরদের প্রবল আধিপত্য লক্ষণীয়।

নীল ঘূর্ণি-র কাহিনি মধ্যে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধতার কথা, বিদ্রোহী চেতনার সুনিপুণ বর্ণনা ভিড় করেছে। বিদ্রোহের প্রাক্ মুহূর্তে গ্রামবাংলার ছবিটি কীভাবে বদলে গিয়েছিল, তারই নিবিড় বয়ান আলোচ্য আখ্যানের কাহিনি হয়ে উঠেছে। আখ্যান নির্মাণ কৌশলের প্রতি আলোকপাত করলে দেখব, নীলকরদের অত্যাচারের সামনে রায়তদের বিদ্রোহী চেতনার নান্দনিক বয়ান স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপে ধরা দিয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তাঁদের ঐক্যের ছবিটি। কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনার পথ ধরেই *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত কৃষকদের সংঘবদ্ধতার সংরূপটি তুলে ধরতে পারি—

১.“পদ্মমণি আবার বললে,—ভাই, মনে রাখবেন, লড়াইয়ে আমরা মোটেই একা নই। যা খবর পাচ্ছি, দেশের আর সব এলাকায়ও রায়তরা আমাদের মতন নীলকরদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। আর ভালুকপোতার খবর তো আপনারা ভালো করেই জানেন। সেখানে রায়তদের মনে কাশীনাথ সর্দারের মান-ইজ্জত আজ দেবতার সামিল। না, শুধু সেখানকার রায়তদের মনেই নয়, আমাদের মনেও তাঁর সেই আসন। তাঁর পথ ধরেই আমরা এগোচ্ছি।”[৩৫]

২.“গোটা বাংলাদেশ যেন অগ্নিগর্ভ। গ্রামাঞ্চল জুড়ে লক্ষ-লক্ষ নীলচাষীদের। মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছে নীলকরদের বিরুদ্ধে এতকালের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আক্রোশের আগুন। শুকনো বারুদ যেন। ভালুকপোতা অঞ্চলের খবর সে বারুদে তাপ সৃষ্টি করছে। আর তার ফলে কোথাও তা সময় সময় দপ করে জ্বলে উঠছে, কোথাও জ্বলছে ধিকিধিকি।”[৩৬]

৩.“দিনে-দিনে গ্রাম বাংলার চেহারা পালটে যাচ্ছে। মারমুখী চাষিরা ফাঁকে পেলেই নীলের লোকদের আর জ্যান্ত ফিরে যেতে দিচ্ছে না। ভালুকপোতা কুঠি অঞ্চলে নীলের আবাদ কমতির দিকে। বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা সুযোগ পেলেই নীলের চাষ বন্ধ করছে।”[৩৭]

৪.“শত-শত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে: জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও নীলের গুদোম। মাটিতে মিশিয়ে দাও ওদের কয়েদখানা। খতম করো নীল কুত্তাদের! ইতিমধ্যে হাজারো কণ্ঠের ভৈরব গর্জন শুনে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে অগুনতি মানুষ ছুটে এসেছে। আসছে এখনও—কাতারে-কাতারে।”[৩৮]

৫.“নীল ঘূর্ণি। বাংলা দেশ জুড়ে নীলের সর্বগ্রাসী ঘূর্ণিঝড় উঠতে আর বুঝি দেরি নেই। দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে কানে আসছে তার দূরাগত ভয়াল গুড়গুড় আওয়াজ আর চাপা গর্জন।”[৩৯]

৬.“দু-দিন যেতে না যেতেই কার্লোর কাছে খবর এল-কাশী ও ফকিরের নেতৃত্বে গোটা তল্লাটের নীলচাষিরা সভা করে ঠিক করেছে, এখন থেকে নীলের চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ, কোনও জমিতে তারা আর নীল বুনবে না। বুনবে ধান কলাই তামাক ও অনান্য ফসল। শুধু তাই নয়, সদর কুঠি আক্রমণ করার এবং নীলের গোলা ও কারখানা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ারও মতলব করেছে তারা।”[৪০]

প্রসঙ্গত *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কাহিনি মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের যে কাঠামো লক্ষ করা গিয়েছে তাকে স্তর অনুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, বিদ্রোহের ধারাবাহিক পূর্ব-প্রস্তুতি থেকে শুরু করে পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের নিবিড় বর্ণনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহের এরূপ বর্ণনা সাধারণত লক্ষ করা যায় না। অধিকাংশ সময়েই কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে তুলে ধরা হয়। কৃষকদের আবেগ অনুভূতিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে প্রথাগত ইতিহাসবিদরা। যেখানে বিদ্রোহী কৃষকদের মিটিং, মিছিল, পঞ্চায়েত প্রভৃতি কার্যক্রমের কথা সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি এলিট শ্রেণির ঐতিহাসিকরা। তবে এই ইতিহাস চর্চায় ছেদ পড়েছে বিশ শতকের দ্বিতিয়ার্ধ থেকে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষকদের বিদ্রোহ পরিকল্পনায়, প্রস্তুতিকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে দেখার চেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ (১৯২৩-২০২৩) তাঁর *এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পেজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* (১৯৮৩) গ্রন্থটিতে বলতে চেয়েছেন—

> "কৃষক বিদ্রোহকে কতকগুলি অর্থনৈতিক শর্ত দিয়ে সরাসরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে যে বিদ্রোহকে মনে হয় আকস্মিক, কিছু অবাস্তব কল্পনার দ্বারা চালিত, আসলে তা কিন্তু এই অর্থে 'স্বতঃস্ফূর্ত' নয়। তার পিছনে থাকে প্রস্তুতি, সংগঠন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটা ছক। এই ছক নিহিত রয়েছে কৃষকচেতনায়। বিদ্রোহের উদ্দেশ্য, তার অলীক চরিত্র, এবং রাজনৈতিক পরিণতি হিসেবে তার অনিবার্য ব্যর্থতা, এ-সবেরই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কৃষক চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক রূপটিতে।"[৪১]

বস্তুত *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনার যে সূচনা, বিস্তার, ক্রমপরিণতির পরিকল্পনামূলক বর্ণনা উঠে এসেছে তার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় নিম্নবর্গের ইতিহাসের চর্চার মূল তত্ত্বের। তবে প্রসঙ্গ অনুসারে বলতে হয় ঔপন্যাসিক দীনেশচন্দ্র সেন কোনো তত্ত্বকথাকে কেন্দ্র করে *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি নির্মাণ করেছেন— এমনটি কিন্তু আদৌ নয়। তিনি আলোচ্য আখ্যানে কৃষক বিদ্রোহের কতগুলি প্রবণতাকে সামনে রেখে কাহিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। নির্দিষ্ট রূপে সেখানে তিনি নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটকে বেছে নিয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চেতনায় নীল বিদ্রোহের সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে তিনি নীল বিদ্রোহের দেশ কালের সাধারণ জনমানসের কথা বলতে চেয়েছেন। আর তাই কোনো বহুল প্রচলিত বিদ্রোহী নেতার ব্যক্তি-জীবন আখ্যানের ভর কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি, সাধারণ বিদ্রোহী যুবক এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধ *নীল ঘূর্ণি*-র কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

(৫)

উনিশ শতকের নবচেতনার কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি নীল বিদ্রোহের সরব উপস্থিতি ও তার প্রতিক্রিয়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) *সেই সময়* (১ম খণ্ড-১৯৮১, ২য় খণ্ড-১৯৮২) উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। নীল বিদ্রোহের অনুষঙ্গে কৃষক সমাজ, জমিদার শ্রেণি ও জমিদারির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির জীবনচর্যার একটি গোটা চিত্র উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায় উঠে এসেছে। উক্ত অনুষঙ্গগুলি কাহিনির নির্ণায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে হয় উপন্যাস নির্মাণের আবশ্যিক শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে কৃষক বিদ্রোহ ও তার ইতিহাস। *সেই সময়* উপন্যাসের কাহিনি অভ্যন্তরে নীল বিদ্রোহের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাত ও ক্রমপরিণতিতে মধ্যমণি হয়ে উঠেছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গঙ্গানারায়ণ। জমিদার রামকমল সিংহের দত্তক পুত্র যুবক গঙ্গানারায়ণকে সামনে রেখে *সেই সময়* উপন্যাসে নীল বিদ্রোহের ঘটনা পরম্পরা বিস্তার লাভ করেছে।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখতে পাই নব্য জমিদার রামকমল সিংহ বাবুয়ানায় ব্যস্ত। আর তাই রামকমলের সাংসারিক কিংবা জমিদারির সকল কাজে বিধুশেখরের মতামতই শেষ কথা ছিল। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ব্যবস্থার সৌজন্যে উনিশ শতকে গড়ে ওঠা নগর কলকাতায় থেকেই জমিদারি তদারকির কাজ সম্পন্ন করেছে বিধুশেখর। যার ফলে কুষ্টিয়ার ভিনকুড়ি গ্রামের চাষি ত্রিলোচন পরপর দু'বছর আকালের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত থেকে এবং শেষ পর্যন্ত বসতি বাড়ি হারিয়ে কলকাতায় নিজেদের জমিদারকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কারণ— "ত্রিলোচন দাস জানতেই পারিনি কবে তার জমিদার বদল হয়ে গেছে।"[৪২] ত্রিলোচনের জমি হারানোর মূলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী ভূমিরাজস্ব নীতিই মূল দায়ি। নতুন জমিদারি ব্যবস্থার ফলে ত্রিলোচন দাসের মতো সাধারণ চাষির অবস্থানগত পরিচয় আলোচনার স্বার্থে তুলে ধরলাম—

> "এবার সে দেখলো নতুন একজন নায়েবকে এবং সঙ্গে নতুন পাইক বরকন্দাজদের। এবং সে শুনলো যে তাকে তিনগুণ খাজনা দিতে হবে। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না। তাদের গ্রামে দু-পাঁচঘর বামুন কায়েত ছাড়া আর সবাই চাষী। সব চাষীরই এক অবস্থা। কেউ কিছুই বুঝলো না। খাজনা না পেলে পাইক-বরকন্দাজরা জোরজুলুম করে লোকের ঘর থেকে ঘটিবাটি কেড়ে নিতে লাগলো। ত্রিলোচন দাসের ঘরে সেরকম বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না বলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো তার বাড়িতে। সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়েই নায়েবমশাই তামাক টানতে লাগলেন। ত্রিলোচন তার পা ছুঁতে গেল, তিনি পা ছাঁটা দিয়ে বললেন, আরে ছুঁসনি, ছুঁসনি। ব্যাটা ভগবানকে ডাক গিয়ে। ভগবান ছাড়া কেউ তোদের আর বাঁচাতে পারবে না।"[৪৩]

প্রথাগত জমিদারি ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন জমিদারি ব্যবস্থার দিনগুলিতে। তাই কুষ্টিয়ার ভিনকুড়ি গ্রামের সাধারণ কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে সপরিবারে কলকাতার রাজপথে নিজ জমিদারের স্বরূপ কল্পনা করার চেষ্টা করেছে। ত্রিলোচনের এই নগর কলকাতায় আসার মূল উদ্দেশ্য হলো, জমিদারের কাছে খাজনা মুকুবের প্রার্থনা জানানো। কারণ একমাত্র জমিদারবাবুর কৃপাদৃষ্টির ফলে ত্রিলোচনার মতো কৃষকেরা বাঁচতে পারে। এই বিশ্বাস নিয়ে ত্রিলোচনের ব্যক্তিমানস কলকাতা শহরে জমিদার বাড়ির পরিবেশ কল্পনা করতে থাকে। ঔপন্যাসিক ত্রিলোচনের জমিদার দর্শনের অভীপ্সার সূত্রে সময়ের বিবর্তন কথাকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ত্রিলোচনের মানস কল্পনায় জমিদারি সত্তার যে বিগ্রহ রূপ চিরস্থায়ী হয়েছিল, প্রকৃত অর্থে তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি উনিশ শতকের এই নগর কলকাতায়।

তবে উপন্যাসের কাহিনি ক্রমশ ত্বরান্বিত হয়েছে নগর ছাড়িয়ে গ্রামজীবনের দিকে। জমিদার রামকমল সিংহের মৃত্যুর পরবর্তীতে ইব্রাহিমপুরে প্রজা অসন্তোষের প্রতিকারের জন্য নীলকরদের কাছে নীলের কারবার বেচে দেওয়ার কথা বলে বিধুশেখর। সেখানে গঙ্গানারায়ণ বলে— ‘‘দেখি আমি নিজে একবার দেকে আসি।’’[৪৪] গঙ্গানারায়ণ যশোরের ইব্রাহিমপুর তালুকে গিয়েছে, যেখানে নীল চাষের জন্য জমি পত্তন নেওয়া আছে। তবে এই নীল চাষেকেই কেন্দ্র করে যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। নেটিভ জমিদারদের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করেছিল নীলকর সাহেবরা। এই প্রবল আধিপত্যকে স্মরণে রেখে বিধুশেখর চান নীলচাষের জন্য পত্তন দেওয়া জমি সাহেবদের কাজে ইজারা দিয়ে দিতে, নীলের বাজার তেজী থাকতে থাকতে দাম বেশ ভালো পাওয়া যাবে। তবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গঙ্গানারায়ণ ইব্রাহিমপুরের নীলকর ম্যাকগ্রেগর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে প্রজা জামালুদ্দীন শেখের স্ত্রী হানিফার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সূত্র ধরে। স্ত্রী হানিফা বিবি অনুসন্ধানে গেলে জামালুদ্দীন শেখ নীলকুঠিতে গেলে তারও আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। নীলকর সাহেবের কীর্তিকলাপ শোনার পরেও গঙ্গানারায়ণের মনে কোথাও সুপ্ত ধারণা ছিল যে, উদ্ভুত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো সমস্যার কোনো সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে। তবে জমিদার গঙ্গানারায়ণের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করার শতভাগ দায়িত্ব নিয়েছে নীলকুঠির সাহেব ম্যাকগ্রেগর। ঔদ্ধত্য ও অশালীন আচরণের মধ্যে দিয়ে গঙ্গানারায়ণের জমিদারিসত্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে নীলকর ম্যাকগ্রেগর। চূড়ান্ত অপমানিত গঙ্গানারায়ণ সংজ্ঞা হারিয়েছে। আখ্যানের কাহিনি বিন্যাসে ম্যাকগ্রেগর সাহেবের এই অশালীন আচরণ, সাধারণ চাষিদের উপর শোষণের ইতিবৃত্ত এবং সর্বোপরি নারীদের সম্মান লুণ্ঠনের অনুষঙ্গ নীলকর সাহেবদের সহজাত গুণাবলীকেই নির্দেশ করে। দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* (১৮৬০) নাটকের কথা নিশ্চয় মনে পড়বে। যেখানে নারীলোলুপ পি. পি. রোগ সাহেব গৃহবধূ ক্ষেত্রমণির সর্বনাশ করেছে পদী ময়রাণীর সাহায্যে। প্রসঙ্গত আলোচ্য আখ্যানে হানিফা বিবির সম্ভাব্য করুণ পরিণতি একই হয়েছে সহজেই অনুমেয়। গ্রামের গৃহস্থ নারী হানিফা বিবি কিংবা তাঁর স্বামী জামালুদ্দীন শেখ সকলের কাছে নীলকুঠি ছিল মৃত্যুকূপসম। তবে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ম্যাকগ্রেগর কর্তৃক গঙ্গানারায়ণের অপমান। এই অপমানের মূল উৎস অন্বেষণ করতে গিয়ে আমাদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় কোম্পানির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সনদ আইনের দৌলতে সাহেবরা বাণিজ্যের জন্য এই কৃষিভূমি বাংলাকে বেছে নিয়েছিল। নীল চাষের জন্য কোম্পানি শাসক একাধিক আইনও প্রণয়ন করেছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) -এর আমলে ১৮৩০-এর কুখ্যাত পঞ্চম আইনে দাদন গ্রহণকারী কৃষকের নীল চাষ না করা আইন বিরুদ্ধ ঘোষিত হলে[৪৫] নীলকরদের প্রবল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এই বাংলায়। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী দিনগুলিতে নীলের চাহিদা আকাশ ছুঁলে গ্রামবাংলায় ধান সহ অন্যান্য ফসলের জায়গা দখল করেছিল নীল নামক রঞ্জক দ্রব্যের গাছ। এই নীল চাষের সূত্র ধরেই ঔপনিবেশিক শাসকের হাত শক্ত করেছিল এদেশীয় নব্য জমিদার, মুৎসুদ্দির শ্রেণি এবং অবশ্যই নীলকররা। অপরদিকে বংশপরম্পরায় প্রথাগত জমিদারদের আধিপত্য ক্রমশ বিলুপ্ত হতে শুরু করেছিল। আর তাই *সেই সময়* উপন্যাসে জমিদার গঙ্গানারায়ণকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে সামান্য একজন নীলকর সাহেবের নিকট। প্রাচীন জমিদারদের ক্ষমতা যেন অস্তমিত সূর্যের ন্যায় ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। নীলকুঠি থেকে ফিরে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় গঙ্গানারায়ণের সংজ্ঞা হারানো আসলে প্রাচীন জমিদারের করুণ পরিণতিকেই নির্দেশ করেছে। ইব্রাহিমপুরের সাধারণ কৃষকদের জীবন সংকটের কোনো প্রতিকার বা সমাধান সূত্র নির্দেশ করতে অপারক গঙ্গানারায়ণের বড়ো অসহায় লেগেছে। এই অসহায়তার বিপরীতে নীলকর সাহেবদের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নীলকরদের ক্ষমতা, আধিপত্যের সামনে বিদ্রোহী

জমিদার সমাজ আসলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সংজ্ঞা হারানোর পরবর্তীতে গঙ্গানারায়ণ ইব্রাহিমপুর ত্যাগ করে বারানসীর অভিমুখে যাত্রা করেছে।

এই ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে তথা *সেই সময়* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি নির্মাণে মধ্যমণি হয়ে উঠেছে যুবক নবীনকুমার। ইব্রাহিমপুরে গঙ্গানারায়ণের নিরুদ্দেশের পরবর্তীতে সিংহ পরিবারের সমস্ত আশা ভরসা তিনি। সেই নবীনকুমার কৌতূহলী দু'চোখ দিয়ে নিরীক্ষণ করেছে নিজের জমিদারি এলাকাকে। সেই নিরীক্ষণের সূত্র ধরেই উঠে এসেছে ইব্রাহিমপুরের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। দিবাকর ও নবীনকুমারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নীলকরদের দাপাদাপি ও নীল চাষের ভয়াভহতা এবং জমিদারি ব্যবস্থার কঙ্কালসার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> "দিবাকর বললো, আর একটুখন অপিক্ষা করুন। ময়না ডাঙ্গার আর দেরি নেই। এ জায়গাটি ভালো নয়কো।
> —কেন, এ জায়গাটি মন্দ কিসের?
> —এখেনে বড় নীলকর সাহেবদের হেঙ্গামা। ঐ যে টিলার ওপর বাড়িটে দেকচেন, ঐটে নীলকুঠি।
> —নীলকুঠি রয়েচে বলে কি এ তল্লাটে মানুষজন যেতে পারবে না? এ আবার কেমন ধারা কতা?
> —আজ্ঞে, নীলকররা বড় অত্যেচার করে। মানীর মান রাকতে জানে না। এখেনকার লোকজন অনেকে ভয়ে পালিয়েচে।
> —কী নাম বললে জায়গাটার? ইব্রাহিমপুর। এখেনে আমাদের জমিদারি আচে না?
> —ছিল, সে সব জমি আমরা নীলকরদের ইজারা দিয়ে দিইচি। ওনাদের অত্যেচারে আর রক্ষে করা গেল না। ভালো আখের খেত ছেল, বড়বাবুর আমলে ইব্রাহিমপুর থেকে বিলক্ষণ মোটা টাকা উশুল হতো, সে সব গ্যাচে, রয়েছে শুধু কুঠিবাড়িটি।
> — সেখেনে কে থাকে?
> —জনাচারেক কর্মচারী রাকা হয়েচে, দেকাশুনো করে।
> —বজরা ভেড়াও, আমি সেই কুঠিতে একবার যাবো।
> —আজ্ঞে হুজুর, ও কতা উচ্চারণ করবেন না। সাধ করে কেউ নীলকরদের কাচ ঘ্যাঁষে? কতায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা আর নীলকরে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।"[৪৬]

উনিশ শতকে নীলকরদের আধিপত্য কতদূর বিস্তার লাভ করছিল তারই যেন বর্ণমালা হয়ে উঠছে উপরিউক্ত উদ্ধৃতি অংশ। গঙ্গানারায়ণের নিরুদ্দেশ পরবর্তী সময়পর্বে কলকাতা নিবাসী নবীনকুমারের কাছে জমিদারি বড়োই দুরূহ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই নবীনকুমার ইব্রাহিমপুরের অলাভজনক কুঠি বাড়িটি বেঁচে দিতে চেয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আসলে নীলকরদের প্রতাপের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সমতুল্য।

তবে *সেই সময়* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে গঙ্গানারায়ণের প্রত্যাবর্তন আখ্যানকে উদ্দেশ্যমুখী করে তুলেছে। গঙ্গানারায়ণের প্রবাস জীবনে ইব্রাহিমপুরের স্মৃতি উঁকি দেওয়ার মধ্যেই আসলে গঙ্গানারায়ণের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই নদীবক্ষে বিন্দুবাসিনীকে হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত গঙ্গানারায়ণ শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিমপুরেই ফিরে এসেছে। নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে গঙ্গানারায়ণ। জামালুদ্দীনের পিতাকে গঙ্গানারায়ণ বলেছে—

> "বৃদ্ধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শান্তভাবে বললো, আমি তোমার ছেলের সন্ধান করবো বলে কথা দিয়েছিলুম, তারপর আমার কী মতিভ্রম হলো, সে কথা রাখিনি, কিন্তু সেই টানে আমি আবার ফিরে এসিচি।"[৪৭]

প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী সময়পর্বে গঙ্গানারায়ণ দেশের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করেছে। ততদিনে বাংলাদেশের কৃষিভূমিতে নীল নামক রঞ্জক দ্রব্যের গাছ স্থায়ীভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জমিতে কুঠিয়াল সাহেবের 'লোভদৃষ্টি পতিত' হয়েছিল।[৪৮] সাধারণ কৃষকদের ভাগ্য নীলের দাদনের নিকট বাঁধা পড়েছে। এমতাবস্থায় ইব্রাহিমপুর সহ গ্রামীণ জনপদে অনিচ্ছুক রায়তের কৃষিজমিতে নীলের দাগ দেওয়ার ঘটনাপ্রবাহ আতঙ্কেরই নামান্তর। এই আতঙ্কের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি নীলকর ম্যাকগ্রেগর সাহেব। থমথমে পরিবেশে গঙ্গানারায়ণের সক্রিয়তা নীলকর ম্যাকগ্রেগরের কাছে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাকগ্রেগরের শ্যামচাঁদ গঙ্গানারায়ণকে স্পর্শ করলে, গঙ্গানারায়ণ অত্যাচারী নীলকরকে

ভূপতিত করেছে। রায়তারাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে গঙ্গানারায়ণের। তবে নীলকরদের প্রবল পরাক্রমে ইব্রাহিমপুর ভস্মীভূত ও জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে। গহীন অরণ্যে দিনযাপন করতে হয়েছে প্রতিবাদী গঙ্গানারায়ণ। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কিংবা নীলকরদের বাণিজ্য প্রসারে জমিদারশ্রেণি সহায়কের ভূমিকাই পালন করেছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নীল বিদ্রোহ। এই নীল বিদ্রোহে জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি গঙ্গানারায়ণ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে—

> "রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়কের মত কোনো ভূমিকা নেবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু পাকেচক্রে তাকে প্রায় সেরকমই হতে হলো। জঙ্গলের আস্তানা থেকে সে দু-একবার বাইরে বেরুবার চেষ্টা করেই বুঝলো, আবহাওয়া অতিশয় উষ্ণ, চাষীদের সঙ্গে নীল কুঠীয়ালদের সংঘর্ষ লাগছে প্রায়ই। ম্যাকগ্রেগারের চ্যালা-চামুণ্ডারা শিকারী কুকুরের মতন গঙ্গানারায়ণের সন্ধানে চতুর্দিকে শুঁকে শুঁকে ফিরছে, গঙ্গনারায়ণের প্রহারে নাকি ম্যাকগ্রেগরের একটি চক্ষু বিষমভাবে জখম হয়েছে, এর প্রতিশোধ তারা নেবেই। গঙ্গানারায়ণের চেহারার বর্ণনা এবং পরিচয় এ তল্লাটে কারুর আর অজানা নেই। কোনো অপরিচিত গ্রামবাসীও গঙ্গানারায়ণকে দেখলে কাছে এসে মিনতি মাখা কণ্ঠে বলেন, বাবু, আপনে শিগগৈর পালান, আপনেরে ধরতি পাল্লি সাহেবরা আপনের কইলজ্জা টাইন্যে ছিড়ে ফেলবে!"[৪৯]

তবে জমিদার গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ার পরও নীলকরদের প্রবল আধিপত্য ও নিপীড়নের কথা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। নীল বিদ্রোহের প্রবল প্রতাপের কাছে পরাভূত হয়েছে জমিদার গঙ্গানারায়ণ। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গঙ্গানারায়ণকে রক্তাক্ত হতে হয়েছে। কারাবাসের পরবর্তীতে ফিরে গিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নগর কলকাতার জীবনে। সেই সঙ্গে বদলে গিয়েছে গঙ্গানারায়ণের জীবন দৃষ্টিভঙ্গি। *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখুয্যের সঙ্গে আলোচনায় গঙ্গানারায়ণ জানিয়েছে— "কিন্তু লাঠি-বন্দুক নিয়ে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে কি আর পাড় পাওয়া যাবে? আইনের সুযোগ নিয়ে দাবি আদায় করতে হবে চাষীদের।"[৫০] শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণ প্রতিবাদের পথ পরিত্যাগ করে আইনি পথ বেঁছে নেওয়ার কথা বলেছে। গঙ্গানারায়ণের পক্ষে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। কারণ প্রকৃত অর্থে নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল সাধারণ কৃষকরা। আর তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কার্যত *সেই সময়* উপন্যাসে নীলকরদের আধিপত্য, শোষণ এবং প্রতিরোধের কতগুলি প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন মাত্র গঙ্গানারায়ণকে সামনে রেখে।

পরিশেষে বলতে পারি *ইছামতী* থেকে শুরু করে *নীল ঘূর্ণি* কিংবা *সেই সময়* উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায় নীল চাষের সঙ্কট সম্ভাবনা থেকে বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাস সমূহের কাহিনি বয়ান, চরিত্র নির্মাণ সবেতেই ঔপন্যাসিকের দীর্ঘ প্রস্তুতু লক্ষণীয়। তাই উপন্যাসের কাহিনি মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসকের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা থেকে নীলকরদের অমোঘ প্রভাবের কথা উঠে এসেছে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে মান্যতা দিয়েই। সর্বোপরি নীল বিদ্রোহের গ্রামবাংলায় সাধারণ কৃষক সমাজের অপার ভূমিকা তথা বিদ্রোহী চেতনা উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। যা আসলে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষক জীবনচর্যার বাস্তব চিত্র স্বরূপ। প্রতিটি উপন্যাসের কাহিনি স্বতন্ত্র হলেও উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহের নান্দনিক সমাপতনের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে কৃষক জীবনের অন্দর মহলে উঁকি দিতে চেষ্টা করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ঔপন্যাসিকরা। এই কারণেই *ইছামতী, নীল ঘূর্ণি, সেই সময়* শুধু উপন্যাস নয় একই সঙ্গে উনিশ শতকের কৃষক জীবনচর্যার নিদারুণ বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ- ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১৭২
২. মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্যকুমার, *ঔপনিবেশিক বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপান্তর*, পঞ্চালিকা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- মে, ২০২৪, পৃষ্ঠা. ২১০
৩. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭৪
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, নূতন সংস্করণ- ১৩৫৪, পৃষ্ঠা. ১৩১
৫. মিত্র, প্যারীচাঁদ, *জমিদার ও রায়ত*, সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা. ২৩
৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫১
৭. ঘোষ, বিনয়, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (চতুর্থ খণ্ড)*, প্রকাশভবন, কলকাতা, তৃতীয় পুণর্মুদ্রণ- ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১২৯
৮. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চদশ সংস্করণ- ১৪১১, পৃষ্ঠা. ২৫৩
৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৫৩
১০. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৫৩
১১. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৫২
১২. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৬৫
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *ইছামতী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ- ২০১৫, পৃষ্ঠা. ১১
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৮
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা.৩০
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ৬৫
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৯
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৫৫-১৫৬
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৭১
২০. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৮৯
২১. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৯১
২২. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৪
২৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৪
২৪. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ- ২০২০, পৃষ্ঠা. ৪২-৪৩
২৫. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পত্রভারতী, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ- আগস্ট ২০২২, ভূমিকা অংশ
২৬. ঐ, ভূমিকা অংশ
২৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৭
২৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ২২
২৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩১
৩০. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩১
৩১. মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্যকুমার, *বাংলার ভূমিব্যবস্থা, জরিপ ও রাজস্বের আইনগত বিবর্তন*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০২১, পৃষ্ঠা. ৬৯
৩২. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৭
৩৩. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৫
৩৪. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৭

৩৫. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭
৩৬. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৯
৩৭. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৫
৩৮. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭০
৩৯. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭৫
৪০. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭৬
৪১. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮
৪২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, আনন্দ, কলকাতা, সপ্তদশ মুদ্রণ- চৈত্র ১৪২৫ ব., পৃষ্ঠা. ৫৩
৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫৩
৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৬১
৪৫. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯৩
৪৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৯৮
৪৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৭৮
৪৮. চন্দ, পুলক, *নীল বিদ্রোহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা. ৩০
৪৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৮৯
৫০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫১৪